সুচিত্রা ভট্টাচার্য

নারী চেতনার উন্মেষ

সম্পাদনা :
ড. সঞ্চিতা সাহা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য:
নারী চেতনার উন্মেষ

সম্পাদনা
ড. সঞ্চিতা সাহা

অশোকপাথা

SUCHITRA BHATTACHARYA: NARI CHETONAR UNMESH
A Collection of essays on Bengali author Smt. Suchitra Bhattacharya
Edited By Dr. Sanchita Saha

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকবৃন্দ

প্রচ্ছদ: হিরণ মিত্র

অক্ষরবিন্যাস: আক্ষরিক, মানকুণ্ডু, হুগলি ৭১২ ১৩৯

মুদ্রক: অশোকগাথা, অশোকনগর, উ. ২৪ পরগণা, ৭৪৩২২২

প্রকাশক: অভিষেক চক্রবর্তী, অশোকগাথা
অশোকনগর, উ. ২৪ পরগণা, ৭৪৩২২২
ইমেল: chakrabortyabhishek74@gmail.com
ফোন: ৭৫০১৭৪৬৪৬৫

বিনিময়: ৩০০.০০ (Three Hundred Rupees Only)

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম; যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সূচিপত্র

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আমি রাইকিশোরী'- চরিত্র চিত্রায়ণে এক অভিনব পর্যবেক্ষণ
শতাব্দী ধন ৭

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাচের দেওয়াল': দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্বুনন
ড. হৈমন্তী বর্মণ ১৪

'কাচের দেওয়াল': দাম্পত্য সঙ্কট, বিচ্ছিন্নতা
নাতাশা পারভীন ২৫

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাস: অসুখী দাম্পত্যে বিপর্যস্ত কিশোর-কিশোরী
রুবিয়া বানু ৩১

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে: অদিতির সাহিত্য প্রতিভার অন্বেষণ
সামু ওঁরাও ৩৯

'দহন' নারী কণ্ঠে নারী স্বাধীনতার মূল্যবোধ
সোনালী মন্ডল ৪৬

প্রেক্ষিত 'দহন': উপন্যাস থেকে সিনেমা
ড. শাওলি মুখোপাধ্যায় ৫০

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসের আলোকে: নারীর সামাজিকদহন ও অন্তর্দহন-এর আলেখ্য
মমতা রায় ৫৫

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'রঙিন পৃথিবী': একুশ শতকের নগরজীবনের প্রতিচ্ছবি
বিপাশা হালদার ৬৩

'একা': জনবহুল জীবনের এক নিঃসঙ্গ প্রতিচ্ছবি
দেবাঙ্গনা বিশ্বাস ৬৬

'বিষাদ পেরিয়ে': বিশ্বায়ন পরবর্তী নারী-পুরুষের জীবন ও সম্পর্ক: দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ
প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ৭০

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'ভাঙন কাল' ও 'গভীর অসুখ' উপন্যাস অবলম্বনে বাঙ্গালি
মধ্যবিত্ত জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়:
রিম্পা মাইতি ৭৭

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনচিত্র
মণিমালা মাইতি (রায়) ৮৯

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন দম্পতির সন্তানেরা
সুকন্যা পাঁজা ৯৭

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একবিংশ শতকের উপন্যাস: জীবন জটিলতার বাস্তব দলিল
কেয়া দাস ১০৫
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যসে আধুনিকতা
সৈয়দ রওনক ফারহিন ১১২
মিতিন মাসির গোয়েন্দাগিরি
ড. অনুপম সরকার ১১৫
মিতিনমাসি গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টির প্রেক্ষাপট: সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব
রাইসা রহমান ১২২
'আমি মাধবী': মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়ায় অবহেলিত নারীত্বের এক আবহমান বয়ান
অভিজিৎ সাহা ১৩০
আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত ছোটোগল্প:
একটি বিশ্লেষনী পাঠ
মাসুদা নাজরি ১৩৯
নারী মুক্তির আলোয়; সুচিত্রা ভট্টাচার্য
শিউলি শীট ১৪৫
এক নারীর জীবন সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার লড়াই: সুচিত্রা ভট্টাচার্য
সমাপ্তি দাশগুপ্ত ১৫১
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখনীতে: নারী জীবনের এক অনন্য দলিল
রিয়া দে ১৫৮
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে আত্মউপলব্ধি, আত্মতৃপ্তি,
অন্তদ্বন্ধ চাহিদার বাস্তবতার রূপায়ণের বহিঃপ্রকাশ
প্রিয়াংকা বোস (পাল) ১৬৬
সুচিত্রা ভট্টচার্যের গল্প: চাহিদার যাঁতাকলে পিষে যাওয়া মধ্যবিত্ত
বনাম বর্ণময় স্বপ্নিল সত্তার সংঘাত
ইনাশ্রী মন্ডল ১৭১
'মধ্যবিত্ত' ও 'টান'; মনের দ্বন্দ্ব
মোনালিসা খাটুয়া ১৭৮
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প: দাম্পত্য অশান্তির প্রেক্ষিতে নারীজীবনের প্রতিলিপি
মৌমিতা পোদ্দার ১৮৪
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত ছোটোগল্পে দাম্পত্য: একটি মূল্যায়ন
সায়ন্তনী ব্যানার্জি ১৯১
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প: দাম্পত্য সংকট ও নারীর জাগরণ
সুতপা পাল ২০৪
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প: সামাজিক পারিবারিক মননে চরিত্রদের আঁতের কথা
শ্রীতমা রায় ২১৩
'শেষবেলায়' সম্পর্কের মায়াজাল
ড. সঞ্চিতা সাহা ২১৭

মিতিনমাসি গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টির প্রেক্ষাপট: সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব

রাইসা রহমান

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পাঠক একুশ শতকে মিতিনমাসির মতো গৃহ নিপুণা গোয়েন্দা চরিত্র দেখতে এবং জানতে শিখল। চুড়ি পড়া হাতও যে, বন্দুক হাতে তুলে নিতে পারে এবং জানে সেটাও পাঠক দেখল। অভ্যস্ত হাতে শুধু সেই থেকেই। অন্যদিকে সংসার সন্তান সামলানোর পাশাপাশি নামী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পথ সামলেও জটিল মনস্তত্ত্বমূলক অপরাধের জট ছাড়িয়ে ফেলা যায়, সেটাও দেখল পাঠক গোয়েন্দা গার্গীকে দেখে। যদিও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পাঠক চুড়ি পরা, খুন্তি নাড়া হাতে বন্দুক চালানো দেখতে অভ্যস্ত। তারপরেও মনে প্রশ্ন আসে, অপরাধ জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই শক্তিশালী গোয়েন্দারা এমন আটপৌরে হয়ে থেকে গেল কেন!

প্রথম মেয়ে গোয়েন্দা বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণাকে দেখে অবাক হতে হয়। কৃষ্ণা কলেজ পড়ুয়া। অত্যন্ত মেধাবী এবং রূপসী। সে ঘোড়ায় চড়তে পারে। রিভলভার চালাতে জানে। দেশি-বিদেশি অনেকগুলি ভাষায় কথা বলতে পারে অনর্গল। কৃষ্ণার মাসতুতো দিদি কৃষ্ণার পরিচয় বিষয়ে তার বন্ধুদের কৃষ্ণার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে আর বিষয় বেশ গর্ব করেই বলেছে যে, কৃষ্ণা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে কোনোদিন বিয়ে করবে না। এই বিষয়ে সিমোন দ্য বোভোয়ার মাতৃত্বের শৃঙ্খলের কথা মনে পড়ে । ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ে আসলে সন্তান উৎপাদনের পূর্ব প্রস্তুতি। স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকার সিদ্ধান্ত লেখিকার এক সময়কালে তো বটে বর্তমান বিংশ শতকীয় সমাজে বিরলতম। আসলে ভারতীয় নারীকে সারাজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে

'ফ্রিডম ফ্রম রিপ্রোডক্টিভ স্লেভারি' সমর্থন করতে হয়। প্রভাবতী দেবীর আর একটি চরিত্র শিখার ক্ষেত্রেও এই একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী মুখ কৃষ্ণা ও শিখা। লেখিকা সেই কারণেই বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই মেয়েরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, অনেক বাঙালি পুরুষও তা পারবে না।

এরপর যে গোয়েন্দা চরিত্রের সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটল তিনি হলেন গোয়েন্দা গন্ডালু। এনিড ব্লাইটনের 'ফেমাস' ফাইভের আদলে গড়ে তুলেছেন লেখক। বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে সন্দেশের পাতায় প্রকাশিত এই স্কুল পড়ুয়া চার মেয়ে কালু, মালু, টুলু ও বুলুর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। 'পান্ডব গোয়েন্দা'দের দুই মেয়ে বাচ্চু ও বিচ্চুর কথাও মনে পড়ে। পাঠকের মনে যখন মেয়ে গোয়েন্দা বলতে কলেজ পড়ুয়া, স্কুল পড়ুয়া, কিশোরী মেয়ের ছবি ভেসে ওঠে। সেই সময় বাঁধাধরা গতের বাইরে এসে সুচিত্রা ভট্টাচার্য আমাদের এক নতুন গোয়েন্দা নারী চরিত্র উপহার দিলেন। তিনি আমাদের সকলের পরিচিত ঘরের মেয়ে মিতিনমাসি ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী।

গোয়েন্দা যখন নারী, তখন নারীবাদী চিন্তাভাবনাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নারী অধিকারের প্রথম তরঙ্গ আসে উনিশ শতকের নবজাগরণের পথ বেয়ে। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করা ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেক বড় ব্যাপার। বিশ শতকের শেষ দিকে আমরা দেখতে পাই নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বেশ খানিকটা সাম্য এসেছে। শুধুমাত্র বিয়ের কারণে এক নারী নিজের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে গৃহবধূর ভূমিকায় জীবন অতিবাহিত না করে, বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করতে সক্ষম এবং সফল হচ্ছে। আর এই সমস্ত কিছুর প্রভাব বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যেও ফুটে উঠল। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের চরিত্ররা ছিল কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা। এই প্রথমবার মহিলা গোয়েন্দা হলেন একজন বিবাহিত এবং কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত মেয়ে।

মিতিনের ভালো নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জী। সে কলকাতার ঢাকুরিয়াতে থাকে। বোনঝি টুপুরের কাছে সে মিতিন মাসি। প্রিয় বাঙালি পাঠকের কাছেও মিতিনমাসি। মিতিনের সহকারী হিসেবে টুপুরের সব কেসে সাহায্য করে। মিতিনের স্বামী পার্থ। তিনি প্রেসে কাজ করেন। তিনি খাদ্য রসিক ও কল্পনাবিলাসী। পুলিশের ডি আই জি অনিশ্চয় মজুমদার মিতিনের কাছে মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে আসেন। প্রজ্ঞাপারমিতা অরফে মিতিন মাসি অপরাধ বিজ্ঞান, ফরেন্সিক

সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র— এর খুঁটিনাটি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, নানারকম আইন সবকিছু নিয়েই চর্চা করেন। তিনি ক্যারাটেও জানেন। রান্নাতেও পটু মিতিন মাসি।

ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরৎ' সিনেমা কমবেশি সকলেই দেখেছেন। পিসি (রাখি গুলজার) চরিত্রটি নিশ্চয় সকলের মনে আছে। ২০০৩ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরৎ' রিলিজ হয়েছিল। আগাথা ক্রিস্টির 'Mirror cracking from side to sid' কাহিনী অবলম্বন করে ঋতুপর্ণ— এর এই সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল। বাঙালি সেকেলে বিধবা এক গৃহবধূ ব্যোমকেশ বা ফেলুদার মতো ঘরে বসে কেস স্টাডি করে রহস্যের উন্মোচন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

গোয়েন্দা বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঠোঁটে পাইপ, মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট এবং খাড়া নাকওয়ালা একজনের অবয়ব। এক কথায় একজন শার্লক হোমস! গোয়েন্দা বলতে পুরুষ গোয়েন্দাদেরই আমরা কম-বেশি সকলেই চিনি, সে গল্পেরই হোক অথবা বাস্তবের। এক্ষেত্রে আগাথা ক্রিস্টির মিস মার্পেল এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনমাসি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, সময়টা ১৮৫৬ সাল। অ্যালনি পিংকারটন নামে এক ভদ্রলোক শহরে একটি এজেন্সি খুলে বসেন। এজেন্সির নামও বেশ চমক আছে। নাম 'পিংটারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি'। এজেন্সির জন্য কয়েকজন পেশাদার গোয়েন্দা এবং একজন মহিলা সেক্রেটারি চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন অ্যালান। অনেকেই এসে ইন্টারভিউ দিয়ে গেলেন। হঠাৎ একদিন ২২-২৩ বছরের এক তরুণী এসে উপস্থিত। অ্যালান তাকে দেখে ভাবলেন মেয়েটি সেক্রেটারির পদে চাকরির জন্য এসেছে। কিন্তু তরুণী জানায় যে সে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতে চায়। গোয়েন্দাগিরি নারীদের পেশা নয় এটা বোঝাতে চাইলেন অ্যালান। কারণ এই কাজে আছে পদে পদে বাধা-বিপত্তি, প্রাণের ঝুঁকি, সম্ভ্রম হারানোর ভয়। মেয়েটি তো দমবার পাত্রই নয়, নাছোড়বান্দা একেবারে। মেয়েটির যুক্তি মেয়ে হলেই করা অনেক সহজ হয়ে যায়। অপরাধীদের বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে অথবা গিন্নির সাথে একবার ভাব করে নিতে পারলেই কেল্লাফতে। এই যুক্তি প্রতিযুক্তি শেষে অ্যালান মেয়েটিকে গোয়েন্দা পদে নিয়োগ করে নিলেন। এটাই হলো একজন মহিলা গোয়েন্দার পেশাদার হিসেবে কাজ করার প্রথম ইতিহাস।

বিশ্বজুড়ে অপরাধীদের ধরতে কিংবা অন্য দেশের গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়ে বহু যুগ আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছেন নারী। দুর্ধর্ষ সেসকল গোয়েন্দাদের

মারাত্মক সব অভিযানের কথা হয়তো আমরা অনেকেই আজও জানিনা। গোয়েন্দাদের নেশাই হল তথ্য সংগ্রহ, এটাই তাদের পেশা। পদে পদে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি। তবু থেমে নেই গোয়েন্দাদের কর্মকান্ড। মাটা হ্যারি, নুর ইয়ানতি খান, এডিথ শাভেল, জোসেফাইল ব্যাকার, ক্রিস্টিনা স্টারব্যাক, আন্না চ্যাপম্যান এরা সকলেই ছিলেন সারা দুনিয়া কাঁপানো দুঁদে গোয়েন্দা।

ইংরেজি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্য পুরুষ গোয়েন্দাদের জয়-জয়াকার। ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কীরিটি প্রমুখের কথা সকলেই জানেন। মজার ব্যাপার হলো মিতিনমাসি, গোয়েন্দা গিন্নিদের বহু যুগ আগেই গোয়েন্দা শিখা, গোয়েন্দা কৃষ্ণারা নানা রহস্যকান্ডের কিনারা করায় ছিলেন অদ্বিতীয়া। যাদের স্রষ্টা ছিলেন লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। প্রভাবতী দেবী নিজের জীবনেও বহু শেকল ভেঙে নিঃশব্দ নারী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। 'পল্লীসখা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রভাবতী দেবী লিখেছেন "মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয় । যে সময়টা বিকাশের, সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। অন্য দেশে সে সময়টা বালিকাকাল বলিয়ে গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময় গৃহের বধূ, অনেক সময় সন্তানের মা।"

প্রভাবতী দেবীর নিজের জীবনেও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু নিজের মনের জোরেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত তিনি বাঁচেননি। তিনি নিজের শর্তে বেঁচেছেন। যার জীবন কাহিনী নিজের রচিত কাহিনী আদর্শ হতে পারতো মেয়েদের কাছে অথচ হঠাৎ করে তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে প্রায় ভ্যানিশ হয়ে গেলেন। প্রকাশকদের কাছেও বাতিল হয়ে গেলেন হঠাৎ করেই।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনমাসি নামটি শোনা মাত্রই হয়তো আপনাদের মনে কোন শাণিত চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত যুবতী গোয়েন্দাকে কল্পনা করবে না কেউ। বাঙালি পরিবারে, এমন আদুরে মেয়ের ডাকনামের অভাব নেই। ফেলু মিত্তিরের নাম থেকে যেমন প্রদোষচন্দ্র মিত্রের মস্তিষ্কের ধূসর কোষ আর টেলিপ্যাথির দক্ষতা বোঝার উপায় নেই। তেমনই মিতিন নাম শুনে বোঝার উপায় নেই যে, এই নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক রাশভারি পোশাকি নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের মতে প্রজ্ঞাপারমিতা শব্দের অর্থ হলো—'জ্ঞানের দেবী'। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্মিত চরিত্র মিতিন বা প্রজ্ঞাপারমিতারও জ্ঞানের তুলনা হয় না। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ, অপরাধীদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারদর্শী, আধুনিক এবং প্রাচীনকালের অস্ত্রশস্ত্রের খুঁটিনাটিও জানেন তিনি। দেশ-বিদেশের

ইতিহাস-লোককথা-ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন। আরেকদিকে ক্যারাটেও জানেন। ধর্মশাস্ত্র বিষয়েও প্রচুর জ্ঞান তার । এই সমস্ত জ্ঞানই তাকে সহায়তা করেছে বিভিন্ন ধরণের কেসের সমাধান সূত্র বার করতে। বাচ্চা সামলানো থেকে শুরু করে ঘর গোছানো, রান্নাবান্না করতে সে পটীয়সী। তাই মিতিনমাসি সম্পর্কে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সে যে রাধে সে চুলও বাঁধে।

গোয়েন্দাদের শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে কাজ করতে হয়, তাই নয়। অনেক সময় মারপিট করতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। এই শারীরিক সুস্থতাও খুবই জরুরী এক্ষেত্রে। মধ্য তিরিশের মিতিনমাসি নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন। স্বভাবে তিনি যতই শান্ত হোন, কিন্তু সামনে শত্রু এলে তাকে আঘাত করতে তার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সঙ্গে একটি রিভলবারও থাকে সবসময়।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোয়েন্দাদেরও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। মিতিনমাসিও সেটা বুঝেছেন। তাই নিজেই গাড়ি চালিয়ে যান সব জায়গায়। কম্পিউটারও জানেন ভালোই। একটি স্মার্টফোনও আছে তার। মিতিনমাসির চরিত্রের সঙ্গে ব্যোমকেশ চরিত্রটির বেশ মিল পাওয়া যায়। রহস্যভেদের উদ্দেশ্যই একমাত্র লক্ষ্য নয় তাদের বরং তারা চেয়েছেন যেকোনো ঘটনার গভীরে গিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে। দেবী দুর্গার কপালের মাঝখানে জ্বলজ্বল করে তার তৃতীয় নয়ন। এই ত্রিনয়নে দিব্যদৃষ্টি। এই তৃতীয় নয়নই আলো দেখায়, পৌঁছে দেয় সত্যের কাছাকাছি। তাই সত্যের উদঘাটনের জন্য মিতিনমাসি যে সংস্থা বা এজেন্সি খুলেছিলেন তার নাম দিলেন 'তৃতীয় নয়ন'। পরে সেটি ভাষান্তরে হয়ে যায় 'থার্ড আই'।

মিতিনমাসির বাড়ি আধুনিক ঢাকুরিয়ায়। টুপুরদের অর্থাৎ অবনী-সহেলিদের বাড়ি উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে। তাই কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বারবারই উঠে এসেছে ঢাকুরিয়া ও হাতিবাগানের কথা। আর তার মাধ্যমেই প্রকট রূপে কলকাতা শহরের দুই জায়গায় জীবনযাত্রার বিশাল অংশ জুড়ে আছে। কলকাতার উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের চিত্র খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা ক্লেদ-কলুষতা দেখানো হলেও মিতিনমাসির কাহিনীতে পরিবারের ইতিবাচক দিকগুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে নেতিবাচক দিকগুলি যে নেই, তাও নয়। তবে সেটাও কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই তুলে ধরা হয়েছে।

দুই ধরণের পাঠকের কাছে মিতিনমাসি সিরিজটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমত — ইতিহাসের প্রতি যাদের আগ্রহ আছে। দ্বিতীয়ত— ভ্রমন করতে বা ভ্রমণকাহিনী পাঠ করতে যারা ভালোবাসেন। মিতিনমাসি সিরিজের

প্রতিটা কাহিনীতেই ঐতিহাসিক রেফারেন্সের ছড়াছড়ি। কলকাতা শহরটি ঐতিহাসিকভাবে ঠিক কতটা সমৃদ্ধ, আর তার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের কত চমকপ্রদ কাহিনী। এই সিরিজটি না পড়লে তার অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। ভারতে ও কলকাতায় যে সমস্ত স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন ইহুদি, আর্মেনিয়ান, পারসিক, চীনা, জেনদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান ও অজানা তথ্য জানা যায় এই সিরিজ থেকে। একটা সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ধর্মের, বর্ণের মানুষেরা কলকাতা, ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই একবিংশ শতাব্দীতেও তাদের অস্তিত্ব আছে। অতীত আর বর্তমান এর এই মেলবন্ধন এক কথায় অনবদ্য।

মিতিনমাসির কাহিনীতে ভ্রমণের কথা না বললেই নয়। এই সিরিজটি পড়তে পড়তে পাঠক হারিয়ে যাবেন কখনো ঝাড়খন্ডে, কখনো কেরালায়, কখনো বা হিমাচলে। এক ফাঁকে উড়ে আসা যায় সিঙ্গাপুর থেকেও। রোমাঞ্চকর জমাটি বর্ণনা-গুণে প্রতিটি জায়গা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো পাঠকের মনে হতেই পারে এ-কোন রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী নয়, আদ্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী। আপনি হয়তো কৈশোর ফেলে এসেছেন অনেকদিন যাবৎ। তাই ভাবতেই পারেন যে মিতিনমাসির কাহিনী ছেলেমানুষি গল্পমাত্র, আপনার ভালো লাগবে না। কিন্তু সেটা যে একদমই ভুল সে ধারণা ভাঙতে সময় লাগবে না। মিতিনমাসিকে নিয়ে লেখা কয়েকটি কাহিনী তো পুরোপুরি প্রাপ্তমনস্কদের জন্য লেখা। কিশোর বয়সীদের জন্য সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক, সাম্প্রদায়িক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিকভাবে এতটাই ঋদ্ধ যে আপনার পড়তে বসে একঘেয়ে লাগবেনা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে কেউ কেউ one liner-এ নারীবাদী লেখকের তকমা দিলেও, বিষয়টি অতটা সরলরৈখিক নয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য কখনই মহাশ্বেতা বা নিদেন পক্ষে মল্লিকার মতো রেবেল নন। তাঁর লেখার নানা ধরণের রচনা সূচনা যেমন এক একেকটা দশকে হয়েছে, তেমনই সমবৈচিত্রের আধারে তাঁর বিষয়-ভাবনাও নানা রঙে ও অভিনয়ে জারিত। যে সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৮৬'-তে 'যখন যুদ্ধ' লিখছেন। সেই সুচিত্রা ৯৩'তে শিখছেন 'কাচের দেওয়াল'। সময়টা তখন দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সূচনা পর্বের। অর্থাৎ অবধারিতভাবেই চলে আসবে, একের পর এক কসমেটিক ডেভেলপমেন্ট; টেলিফোন, কম্পিউটার, ফ্ল্যাটবাড়ি কালচার, অণু-পরিবার, শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়া, গ্রাম, মফস্বল, ছোট শহরের মেয়েদের পড়াশোনা চাকরি বাকরিতে যোগদান বেড়ে যাওয়া; 'অলীক সুখ'-এর সোনার হরিণের খোঁজে 'কাচের দেওয়াল' বানাতে নিজেদের অবচেতনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভিক্টোরিয়ার ঘাসের রোমান্স তখন উত্তম-

সুচিত্রার হাত ছেড়ে ঋতুপর্ণর কলমে গুটিগুটি পায়ে 'ড্রয়িং রুম ড্রামার' দিকে এগোচ্ছে। বিয়ে থেকে চাকরি— প্রজাপতির ডানার মত মসৃণ না হলেও ধারাবাহিক গতিতে মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। 'অর্ধেক আকাশ', 'রং বদলায়', 'রূপকথা চায়', 'ধূসর বিষাদ', 'আবর্ত', 'হেমন্তের পাখি', 'নীলঘূর্ণি' প্রভৃতি উপন্যাস এসব টানাপোড়েনের জান্তব দলিল।

মিতিনমাসির বই হিসেবে আবির্ভাব ২০০৩ সালে; কিশোর রহস্য উপন্যাস। মিতিনমাসিকে নিয়ে লেখা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের শেষ লেখা 'স্যান্ডর সাহেবের পুঁথি' ২০১৫ সালে। সময়কালটা একটু লক্ষ্য করুন। ২০০৩ থেকে ২০১৫ সাল এবং তার আগে গোটা কয়েক বছর যদি আমরা হিসেবের মধ্যে রাখিও, তাহলে দেখতে পাবো এই সময় কিশোর পাঠকদের অধিকাংশই 'মিলেনিয়াম কিড'। এরা জন্মাতেই হরেক কৃত্রিমতার গামলায় চুবুনি খেতে বাধ্য হয়েছে। নানা কিশিমের রাসায়নিকযুক্ত বেবিফুড-আলুর চিপস থেকে মোবাইল কার্টুন-নকল ক্রিকেট, ফুটবল থেকে বিদেশি ঘরানার প্লে স্কুল থেকে রাস্তাটা সোজা কখনও গেছে একাকীত্বের কাউন্সিলিং— এ, কোন রাস্তা আবার চকমকে শপিংমলের দরজা থেকে হুকাবার হয়ে মাদক সেবনের অবাধ আড্ডা, রেভপার্টিতে গিয়ে মিশেছে। শিশু মনের মৌলিক যাপন-ভাবনা-চিন্তা রোজ একটু একটু করে পার্সেনটাইলের দৌড়ে মরেছে এবং মরছে। তৈরি হচ্ছে হাজারো লাখোসোসিওপ্যাথ— ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

মিতিনমাসি 'সারান্ডার শয়তানে' কখনও বন্যপ্রাণী নির্ধনকারী পোচার ধরেছেন, কখনো ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারে মগ্ন বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করছেন ('সর্পরহস্য সুন্দরবনে'), কখনও পার্সি ব্যবসায়ীর অপহৃত সন্তানকে উদ্ধার করেছেন ('হাতে মাত্র তিনটা দিন'), বিপ্লব না করেও সংসার আর অফিসে অর্ধেক আকাশের পক্ষে থাকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলম মিতিনমাসির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। মিতিনমাসি সম্ভবত প্রথম বিবাহিতা বাঙালি নারী-গোয়েন্দা চরিত্র। এবং বাণিজ্য সফলও বটে; আর সমালোচকদের অনেকের কাছেই মিতিনমাসি সেরা বাঙালি নারী— গোয়েন্দা চরিত্র। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কিশোর গোয়েন্দা, মিতিনের ভক্তরা অনেকেই কৈশোর এমনকি যৌবন উত্তীর্ণ একথা লেখিকা ভালোভাবেই জানতেন। সদাহস্য, শিশুকে, বন্ধু বৎসল অনুজদের প্রিয় লেখিকা তাই হয়ত মিতিনমাসিকেও টুপুরের সাথে অপরাধের বিরুদ্ধে একাত্ম করেছেন। সেদিনের টুপুররাই আজ-কালকের মিতিন। তাই হয়তো সুচিত্রা ভট্টাচার্য ছয়টি প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দা উপন্যাস লিখলেন, মিতিনমাসিকে নিয়ে; আর সেই প্রাপ্তবয়স্কতার পূর্বাভাস প্রাপ্তমনস্কতার হঠাৎ মেঘের মতো ভেসে

এলো সুচিত্রা কিশোর গোয়েন্দা কাহিনীর আনাচেকানাচেও। হয়তো খানিকটা সচেতনভাবেই সেদিনের মিতিন আগামীর মিতিনদের প্রজ্ঞা ও পারমিতা এই দুই-ই বানাতে চেয়েছিলেন। তাই হয়তো সুচিত্রা এভাবেই অনন্যতার ছাপ রেখে বড় অসময়ে চলে গেছেন।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির এই লেখিকা ও প্রাবন্ধিকের জন্ম ১৯৯৫ সালের ২৯ শে জানুয়ারি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প" নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। খুব অল্প বয়স থেকেই লেখালেখির সাথে যুক্ত তিনি। তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ একাধিক জায়াগা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'একুশ শতকের ছোটোগল্প ও গল্পকার', 'শতবর্ষে বিমল কর', 'সত্তরের দশক: সাহিত্য ও সিনেমা' এই তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থের সম্পাদনা তিনি ইতিমধ্যেই করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জোনাকি' প্রকাশিত হয়েছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: শিল্পে ও বৈচিত্র্যে' তাঁর চতুর্থ সম্পাদিত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

অশোকগাথা

9 789393 591753